ভারতবর্ষ

উত্তম দাস

রচনার উৎস অন্বেষণ : 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধটি 'মাওকের দরবার' হতে গৃহীত হয়েছে। 'রামায়ণের', মধ্য দিয়ে ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধটি।

॥ ২ ॥

আলোচ্য 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক এস্. ওয়াজেদ আলি ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্য তথা ভারতের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন একটি মুদির দোকানকে কেন্দ্র করে। এর জন্য তাঁকে কোনো গুরুগম্ভীর তত্ত্বের দারস্থ হতে হয়নি, বরং সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু পাঠকের মনের মণিকোঠায় জন্ম নিয়েছে কিছু জিজ্ঞাসা। প্রবন্ধপাঠে তার উত্তর উঠে আসবে। প্রবন্ধের মূল বিষয়টি এই রকম—পঁচিশ বছর পূর্বে দশ এগারো বছর বয়সে লেখক কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তাঁদের বাসার কাছেই একটি মুদিখানার দোকান ছিল। সেই মুদিখানায় এক বৃদ্ধ মস্ত এক চাঁদির চশমা নাকের উপরে রেখে, গোঁফ দাড়ি শূন্য গম্ভীর মুখ ও টাক মাথায় চারপাশে সাদা ধপধপে চুল নিয়ে গদিতে বসে মস্ত একটা বই নিয়ে সাপ খেলানো সুরে কী যেন পড়ত। আর মাঝারি বয়সের একটি লোক মাঝে মাঝে দোকানে বেচা-কেনার ফাঁকে বৃদ্ধ লোকটির কাছে এসে পাঠ শুনত। আবার খদ্দের আসলে উঠে গিয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করত। খালি গায়ে বুড়োর কাছে সব সময় বসে থাকতো তাঁর বয়সী একটি ছেলে আর পাশে থাকতো দুটি মেয়ে। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা বৃদ্ধের পাঠ শুনত। লেখক বুঝতে পারতেন ছেলে মেয়েগুলি মনোযোগ দিয়ে পাঠ শুনছে এবং উপভোগ করছে। লেখক বৃদ্ধের পাঠের বিষয়টি সম্বন্ধে জানবার জন্য পরম কৌতূহলে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। এবং বুঝতে পারলেন যে, রামচন্দ্র কী করে হনুমান সৈন্যদের সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কা দ্বীপে পৌঁছেছিলেন—এটাইছিল পাঠের বিষয়।

এই বর্ণনা শুনে তিনিও তন্ময় হয়ে যেতেন এবং বানরদের অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ডেও ছেলে মেয়েরাও আগ্রহে উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো। এই পর্যন্তই তিনি শুনে ছিলেন। তখন সেতু বাঁধা চলছিল—রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিল কিনা, আর পার হয়েই বা কী করেছিল, তা লেখক জানতে পারেননি। কারন দু-চার দিন পর লেখক দেশে ফিরে যান। তার পর কেটে গেছে অনেক দিন। কর্মব্যস্ত লেখকের মন থেকে সেই রামায়ণ পাঠের স্মৃতি হারিয়ে গেছে, পরিবর্তনের নানা স্রোত লেখকের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

লেখক অনেকদিন পর যখন আবার কলকাতায় আসেন তখন লক্ষ্য করেছেন আগের সেই পরিবেশের কত পরিবর্তন ঘটেছে। ঘর-বাড়ি সব বদলে গেছে। আগে যেখানে ঘর ছিল, এখন সেখানে বড়ো ম্যান্‌শন (mansion) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। রিক্সা ও

Scanned with CamScanner

ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া এখন বড়ো বড়ো মোটরের যাতায়াত। গ্যাসের বাতির জায়গায় ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে। হঠাৎ সেই পুরোনো মুদির দোকানটি তাঁর চোখে পড়ল। দেখলেন তার কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেমনটি পঁচিশ বছর আগে দেখেছিলেন ঠিক একইরকম ভাবেই জিনিসপত্র সাজানো আছে—চাল থেকে ঝুলে থাকা কেরোসিনের বাতিটিও পর্যন্ত একই ভাবে ঝুলছে। আরো অবাক কাণ্ড যে, দোকানের ভিতরের দৃশ্যেও নেই কোনো পরিবর্তন। সেই একই বৃদ্ধ ও তাঁর একই সুরে রামায়ণ পাঠ, আর দোকান থেকে মাঝে মাঝে এসে একটি মধ্য বয়স্ক লোক রামায়ণ পাঠ শুনে যাচ্ছিল। আগের মতোই খালি গায়ে বসে পাঠে আগ্রহী ও উৎসাহী তাঁর তখনকার বয়সী ১০/১১ বছরের ছেলেটি ও দুটি মেয়ে। আর পঁচিশ বছর আগে বানর সেনাদের সেতু বাঁধার কথাই তখনও ছিল বিষয়বস্তু। লেখক অবাক ও হতভম্ব হয়ে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন যে, পঁচিশ বছর আগে তিনি এই একই দৃশ্য দেখেছিলেন, তাহলে কি এতদিন পরে বৃদ্ধের বয়স বাড়েনি। ছেলে মেয়েগুলিও কি বড়ো হয়নি; আর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনও কি শেষ হয়নি? অবশেষে বৃদ্ধের কাছ থেকে লেখক জানতে পারেন যে, পঁচিশ বছর আগে তিনি যাকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন বর্তমান বৃদ্ধের পিতা। তিনি মৃত। তখন যে লোকটি দোকানে বেচা-কেনার ফাঁকে এসে পাঠ শুনতেন সেছিল ঐ বৃদ্ধের ছেলে। এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, তার ছেলে এখন দোকানদারী করে, এবং তার ছেলে মেয়েরা বসে রামায়ণ পাঠ শোনে। শেষে বৃদ্ধের হাতের বইটিকে ইঙ্গিত করে প্রাবন্ধিক জানতে পারেন কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা। বৃদ্ধের কথায় তার ঠাকুরদাদা বটতলায় বইটি কিনেছিল। তখন তাঁর জন্ম হয়নি। এসব স্মৃতি-চিহ্নই লেখকের দিব্যদৃষ্টি খুলে দিয়েছে। তাই প্রাবন্ধিকের অনুভব, কালের নিয়মে সব কিছুর বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটলেও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন সনাতন ঐতিহ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এই হল ভারতবর্ষের ঐতিহ্য (tradition)। যা সমানে বয়ে চলেছে। কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি।

॥ ৩ ॥

নামকরণ : ভারতবর্ষ

এস্. ওয়াজেদ আলি'র 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধটি নামকরণের দিক দিয়ে কতটা সার্থক, সেটা নির্ভর করে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য বিষয়ের উপর। তবে সাহিত্য আর বাস্তবের নামকরণ একটু আলাদা। বাস্তবে সৃষ্টির চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জ্বল হওয়ার আগেই নামকরণের কাজটি সু-সম্পন্ন করে ফেলা হয় বলে নামের সঙ্গে চরিত্রের মিল থাকে না। যেমন সাধ করে অনেকে অন্ধবালিকার নাম-সু-নয়নী রাখে। আবার বোবা মেয়ের নাম সুভাষিণী—এই ভুল কিন্তু সাহিত্যে ক্ষমার যোগ্য নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখককে বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই নামকরণ করতে হয়। সেটা কখনও চরিত্রকেন্দ্রিক, কখনো ব্যঞ্জনাধর্মী, কখনো ঘটনাকেন্দ্রিক হয়ে উঠে। এভাবেই সাহিত্যের ভিন্নধর্মী সংরূপগুলির নামকরণ করা হয়।

এক্ষেত্রে প্রাবন্ধিক এস্.ওয়াজেদ আলি আলোচ্য প্রবন্ধে কিছু বাহ্যিক ঘটনার বিবরণ প্রয়োজনের নিরিখে হয়তো দিয়েছেন, কিন্তু সেই বিষয়ের অভ্যন্তরে রেখেছেন—কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ'কে। যে রামায়ণে ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্য ও শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনের ছবি

Scanned with CamScanner

প্রতিফলিত। যে রামায়ণে সমগ্র বাঙালি তথা ভারতবাসী খুঁজে পেয়েছে নিজেকে, জীবনের সত্য রূপ ও চলার পথকে। এই ধ্রুব সত্য সুন্দর রূপকে প্রাবন্ধিক পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন একটি মুদির দোকানকে কেন্দ্র করে চার পুরুষ ধরে রামায়ণ পাঠের মধ্য দিয়ে। এই রামায়ণের গুরুত্ব কোথায়—তা রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকেই বোঝা যায়—"যে জাতিখণ্ড সত্যকে প্রাধান্য দেন, ...মানব জাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী।...যাহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ঋণ কোনো কালে পরিশোধ হইবার নহে।... রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃত-পিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি, বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মলবায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।" (রামায়ণী কথার ভূমিকা, ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বোলপুর, ৫ই পৌষ, ১৩১০)

সমগ্র রচনাটির মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিক ভারতবর্ষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। ঘটনাটি একটি মুদির দোকান। স্থান কোলকাতা। ১০/১১ বছর বয়সে সেখানে প্রাবন্ধিক লক্ষ্য করেছেন সেই দোকানে এক বৃদ্ধ গদিতে বসে সাপ খেলানোর সুরে রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করছেন। মাথায় মস্ত টাক। চারপাশে ধপধপে সাদা চুল; বেশ বিজ্ঞের মতো চেহারা। মাঝ বয়সী লোকটি পাশে এবং একটি খালি গায়ে বসে থাকা ছেলে—পাশে দুটি মেয়ে। পাঠ্য বিষয় ছিল "রামচন্দ্র কী করে কপিসেনার সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কা দ্বীপে পৌঁচেছিলেন"—এর পর লেখক দেশে ফিরে যান। পরিবর্তনের নানা স্রোত লেখকের জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। কিন্তু পঁচিশ বছর পর ফিরে এসে প্রাবন্ধিক পরিবেশের নানা পরিবর্তন দেখলেও সেই দোকানটির কোনো পরিবর্তন দেখেননি। জিনিসপত্র পূর্বের মতোই সাজানো আছে। চাল থেকে সেই কেরোসিনের বাতিটিও ঝুলছে। অর্থাৎ পরিবর্তন শুধু বাইরে ঘটেছে। ভিতরে নয়। সেই একই রকম এক বৃদ্ধ একই বিষয়ে একই সুরে গ্রন্থটি পাঠ করছে। এবং সেই ছেলেটি ও দুটি মেয়ের একই ভাবে সেতু বন্ধনে বানর সেনাদের গল্প শোনা—এবং সবশেষে সেই ঘটনার পরম সত্য উদ্‌ঘাটন। অর্থাৎ প্রাবন্ধিক রামায়ণকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। কেননা রামায়ণ জাতীয় কাব্য। রামায়ণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাব্য। এক কথায় রামায়ণে রয়েছে অন্তর্লীন বাঙালি ভাবুকতা। কেননা রামায়ণের রাম শব্দের মধ্যেই রয়েছে আনন্দের ফল্গুধারা। যেমন রাম শব্দটি √রম্ + ঘঞ্ (অবিধা) = রাম অর্থাৎ যার মধ্যে সকলে রমন করে বা আনন্দ লাভ করে। শুধু সংস্কৃত নয়, বাংলা সহ বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও রামায়ণ চর্চিত হয়। অর্থাৎ প্রবন্ধের বিষয় অনুযায়ী বলা যায়, এই ধরনের মুদির দোকান কিন্তু কোলকাতার বাইরেও সমগ্র ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"রামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও ভারতবর্ষের দ্বারা রামায়ণকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারিবেন।' (রামায়ণ' ৫ই পৌষ, ১৩১০ প্রাচীন সাহিত্য) অর্থাৎ রামায়ণ যে সমগ্র সনাতন ভারতবর্ষের চিরন্তন

Scanned with CamScanner

শাশ্বত ঐতিহ্যকে বহন করে চলছে—'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধটি তারই ইঙ্গিত দেয়। তাই নামকরণ সার্থক বলেই মনে হয়।

॥ ৪ ॥

রামায়ণ ও tradition প্রসঙ্গ : ভারতবর্ষ

'রামায়ণ' ও 'tradition' প্রসঙ্গের দিকথেকে বলা যায় এস্ ওয়াজেদ আলী 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রসঙ্গ এনে রামায়ণের মূল আদর্শটি যে ভারতবর্ষের আদর্শ সেটি বোঝাতে চেয়েছেন। কেননা রামায়ণ হল জাতীয় মহাকাব্য। যেখানে জাতির অন্তর সাধনার পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"তাহা (রামায়ণ) ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ-করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।...আমাদের দেশে গার্হস্থ্য আশ্রমের যে অত্যন্ত উচ্চস্থান ছিল, এই কাব্য তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। গৃহাশ্রম সমস্ত সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিত ও মানুষকে যথার্থ ভাবে মানুষ করিয়া তুলিত।"—যা হৃদয়কে এক পরম শান্ত সুন্দর রূপ দান করে। এটিই হল জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানবের গার্হস্থ্য জীবন চর্চার ছবি। ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় দেশ। এখানে নানা জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ বসবাস করে। তাই রামায়ণ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাব্য। আলোচ্য প্রবন্ধেও লক্ষ্য করা যায় যে, প্রাবন্ধিক পঁচিশ বছর পূর্বে যে বৃদ্ধের রামায়ণ পাঠ শুনেছেন চার পুরুষ ধরে তারাই সেই রামায়ণ পাঠ করে গেছেন। বৃদ্ধের কথায়—"এ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ"—এবং পঁচিশ বৎসর পরে লেখক সেই একই রামায়ণ পাঠ ও রামচন্দ্রের বানর সেনার সাহায্যে সীতা উদ্ধারের জন্য সেতু বন্ধনের কাহিনী শুনেছেন। তখন লেখক অবাক হয়ে গেছেন। অর্থাৎ এক প্রজন্মে বাইরে ইতিমধ্যে অনেক বদল হয়েছে—গ্যাসের বাতির জায়গায় বিজলি বাতি, ঘোড়ার গাড়ির বদলে অনবরত মোটরগাড়ি। কিন্তু মুদির দোকানে কোনো পরিবর্তন হয়নি।—"চাল থেকে এখনও কেরোসিনের একটি বাতি ঝুলছে বোধহয় পঁচিশ বছর আগের সেই বাতিটি"। আগের বৃদ্ধের জায়গায় তার পুত্র, একই রকম বৃদ্ধ সে, আজ একই রকম সুরে সেই রামায়ণ পড়ে চলেছে। এখনও রামচন্দ্র 'সেই সেতু বন্ধনের কাজে ব্যস্ত'। সময় যেন থেমে রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে 'মনে হলো, আমি দিব্য চক্ষু পেয়েছি। প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। সেই tradion সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি'—এখানেই প্রকৃত ভারতবর্ষের অপরিবর্তনীয়তা।

প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সেই অপরিবর্তনীয়তার ধারাই ক্রিয়াশীল যান্ত্রিক সভ্যতার সূত্রে হয়তো বাহ্যিক বস্তুগত কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ভারতবাসীর হৃদয়ের সেই অখণ্ডবোধের; ঐতিহ্যের (Tradition) কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। যদিও সৃজনশীল বিশ্বে সব কিছুই পরিবর্তনশীল, শুধু ভারতবর্ষের মূল ঐতিহ্য বর্তমান আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেও অনেকখানি অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে। এভাবেই লেখক পুরাতন আর আধুনিক বদলে যাওয়া কোলকাতার চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আর আমাদের জিজ্ঞাসার

Scanned with CamScanner

উত্তর আমাদেরই দিয়েছেন রামায়ণের আদর্শের মধ্য দিয়ে। আর এখানেই আলোচ্য প্রবন্ধে 'রামায়ণ' ও 'Tradition' প্রসঙ্গের গুরুত্ব।

॥ ৫ ॥

ভাষা প্রসঙ্গ ও শৈলী : ভারতবর্ষ

ভাষার তরণি বেয়েই পাঠককে রচনার অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু সেই ভাষা কেমন হবে, বা কেমন হওয়া উচিত, তা নির্ভর করে লেখকের মানসিকতার উপর। প্রত্যেক লেখকেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যা অন্য লেখক থেকে নিজের রচনা বৈশিষ্ট্যই আলাদা করে নেয়। মোটকথা প্রকৃত লেখকের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা থাকাটাই স্বাভাবিক। এই যে ভিন্নধর্মী লেখকের ভিন্নধর্মী রচনা বৈশিষ্ট্য—সেটা আসলে তাঁর শৈলী। যেমন ব্যক্তি যখন গোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তখন সে স্বাতন্ত্র্যহীন, কিন্তু গোষ্ঠী থেকে ব্যক্তিকে যখন পৃথক বলে মনে হয়, তখন সে নিজ স্বাতন্ত্র্যে নিজেই সমুজ্জ্বল। এরই নাম ব্যক্তিত্ব বা স্টাইল। আমরা জানি কর্মসূত্রে এস্ ওয়াজেদ আলি প্রমথ চৌধুরীর সাথে পরিচিত ছিলেন। এবং সবুজ পত্রের (১৯১৪) লেখক গোষ্ঠীর সাথেও যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে সাহিত্য গুরু হিসাবে প্রমথ চৌধুরীকে বরণ করেন। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী ঢং এর প্রভাব এস্ ওয়াজেদ আলির রচনায় পড়াটাই স্বাভাবিক। তবে প্রমথ চৌধুরীর সম্পূর্ণ কণ্ঠ ও ভঙ্গীর প্রতিধ্বনি এস্ ওয়াজেদ আলির রচনায় পাওয়া যায় না। বরং নিজস্ব শৈলীর জগতে তিনি ভাস্বর। বিষয়ের রূপ ও প্রকৃতির উপর রচনার বৈশিষ্ট্য তথা স্টাইল অনেকখানি নির্ভরশীল। তবে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি ও চিন্তার বা অন্তঃসত্তার গুরুত্বই সর্বাধিক। তাই বলা হয় 'Style is the man' মোটকথা লেখকের নিজস্ব ভাবাবেগ ও বিশেষ ধরণের অভিজ্ঞতার দ্বারাই বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট কায়া পায়। এবং সেই কায়া বা বিষয়ের প্রাণ দান করেন উপযুক্ত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে। অবশ্য সেই রচনা যদি পাঠকের হৃদয়ে ভাব সঞ্চার করতে না পারে, তাহলে সেটা লেখকের ব্যর্থতা। এক্ষেত্রে তাকে ভাষার সঠিক প্রয়োগের পাশা-পাশি পাঠকের মনোজগত জানতে হয়। সেটা একজন শিল্পির পক্ষেই সম্ভব। এক্ষেত্রে এস্ ওয়াজেদ আলি ও আলোচ্য প্রবন্ধে যথেষ্ট শিল্পীয়ানা পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি ছোটো ছোটো বাক্যের মধ্য দিয়ে রসজ্ঞানের পরিচয় যেমন দিয়েছেন তেমনি সহজ, সরল মুখের ভাষায় গল্পের আঙ্গিকে বিষয়বস্তুকে পাঠকের হৃদয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় রয়েছে গতি, পরিচ্ছন্নতা, সংক্ষিপ্ততা—সেটা অবশ্য মেদবর্জিত। সৌম্য সুন্দর ভাবকে রূপ দিয়েছেন সরল করে। ছোটো ছোটো বাক্যগুলি যেন এক একটি চিত্র। উদাহরণেই তার প্রমাণ মেলে—"বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, চারপাশে তার ধপ্‌ধপে সাদা চুল"—সরল বাক্য, পরিচিত ভাষা, অথচ আমাদের মুগ্ধ করে। এবং অতি অল্পকথায় কীভাবে বিষয়ের গভীরে নিয়ে যায় এবং সত্য উৎঘাটিত হয় তাঁর একটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হল—"দু চার দিন পরে আমি দেশে ফিরে গেলুম। তারপর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম তার ঠিকানা নেই। পরিবর্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধ আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের ছবিটি মনের কোনো গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল। তাদের অস্তিত্বের কথা

Scanned with CamScanner

আমি ভুলে গেলুম। এমন কত শত জিনিস রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।"—এখানে লক্ষ্য করার বিষয় পঁচিশ বৎসর পূর্বের স্মৃতিচারনা করতে বসে তিনি তাঁর ব্যক্তি জীবনের নানা ঘটনার কথা বলতে পারতেন, কিন্তু কোনো বাড়তি কথা না বলে শুধু পুরাতন কোলকাতা ও নতুন কলকাতার কোথায় বস্তুগত ও ভাবগত পরিবর্তন হয়েছে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, তিনি কোনো বাড়তি কথা নয়, শুধু প্রয়োজনের কথাটুকু বলতে পারলেই খুশি।

অন্যদিকে আলোচ্য প্রবন্ধে কোনো জটিল তথ্য নয় সরলভাবেই দু'চারটে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন ২৫ বছরের কলকাতার বাহ্যিক পরিবর্তনের কথা—"আগে যেখানে ঘরছিল, এখন সেখানে বড়ো ম্যান্‌শন (mansion) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।... আগে মিট মিট করে গ্যাসের বাতি জ্বলত, এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটিকে দিনের মতো উজ্জ্বল করে রেখেছে।"—অর্থাৎ সবকিছুর বাহ্যিক পরিবর্তন হলেও মুদির দোকানের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এমনকি দোকানের ভিতরকার দৃশ্যও পরিবর্তন হয়নি। আগের মতো সেই বাতিটিও সেখানে ঝুলছিল। এবং সেই বৃদ্ধের চার পুরুষ ধরে রামায়ণ পাঠও চলেছে। অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষের বস্তুগত বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন হলেও ভাবগত ঐক্য ও ভারতীয় সনাতন ঐক্যের তেমন পরিবর্তন হয়নি। যদি হতই তাহলে চার পুরুষ ধরে সেই মুদির দোকানে রামায়ণ পাঠ হত না। আসলে প্রাবন্ধিক সমগ্র প্রবন্ধে রামায়ণের মূল আদর্শই যে ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ সেটা বোঝানোর জন্য মাত্র দু'বার রামায়ণ শব্দের ব্যবহার করেছেন। অপর দিকে বানরদের সেতু বন্ধনের ক্রিয়াকলাপ দুটি মেয়ে ও একটি ছেলের আনন্দের খোরাক হয়ে উঠেছে। যা শিশু মনে সহজেই আনন্দ দেয়। এভাবেই প্রাবন্ধিক এস্ ওয়াজেদ আলি গুরুগম্ভীর ভাষায় প্রয়োগ করে বিষয়ের গভীরের প্রবেশ না করে সরল ভাষায়, সহজ তথ্য উপস্থাপন করে এক পরম সত্যরূপকে তুলে ধরে নান্দনিক সমীকরণে পৌঁছতে চেয়েছেন।

॥ ৬ ॥

শ্রেণিবিচার : ভারতবর্ষ

শ্রেণি বিচারের দিক থেকে বলা যায় যে 'ভারতবর্ষ প্রবন্ধে বিষয়ধর্মী' প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কিছুটা থাকলেও প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য লেখকের ব্যক্তিগত ভাব রসের মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়েছে। যেকোনো বিষয়ই আত্ম গৌরবী প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে, যদি ব্যক্তিগত অনুভূতি ও হৃদয়ের স্পর্শ তাতে প্রাবন্ধিক রাখতে পারেন। আলোচ্য প্রবন্ধেও সেটা লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রবন্ধটিকে আমরা কিছুটা স্মৃতিচারণ মূলক ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের আওতায় ফেলতে পারি। কেননা এখানে প্রাবন্ধিক ও পাঠকের মধ্যে এক নৈকট্যও ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। আলোচ্য প্রবন্ধেও আমরা লক্ষ্য করি যে লেখক ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের ধরণে—"পঁচিশ বৎসর পূর্বে একবার আমি কলকাতায় এসেছিলুম। তখন আমার দশ-এগারো বৎসর হবে।"—এই বর্ণনাতে লেখকের সাথে পাঠক একাত্ম হয়ে উঠেন সহজেই। শুধু তাই নয়; এমন আরো অনেক সংলাপ আলোচ্য "ভারতবর্ষ" প্রবন্ধে রয়েছে যার মধ্য দিয়ে প্রাবন্ধিকের সাথে পাঠকও যেন স্মৃতির সুতোয় টান দেন। যেমন—

Scanned with CamScanner

(ক) "আমি কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেলুম ভিতরকার দৃশ্য দেখে। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম ঠিক তারই মতো একটি বৃদ্ধ গদির উপর বসে মোটা একটি বই নিয়ে সাপ খেলানো সুরে কী পড়ছিল।"

(খ) আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম। বৃদ্ধ পড়ছিল রামচন্দ্রের সেই সেতু বন্ধনের কথা—পঁচিশ বছর আগে যা শুনেছিলুম।

(গ) 'মনে হল,, আমি দিব্য চক্ষু পেয়েছি।'

এভাবেই প্রাবন্ধিক 'রামায়ণের' মূল আদর্শের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সনাতন ঐতিহ্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন উদাহরণের প্রাচুর্য ও সৌষম্য বজায় রেখে।

Scanned with CamScanner